বর্ণ ও শাকা লাকা বুম বুম

আনিসুল হক

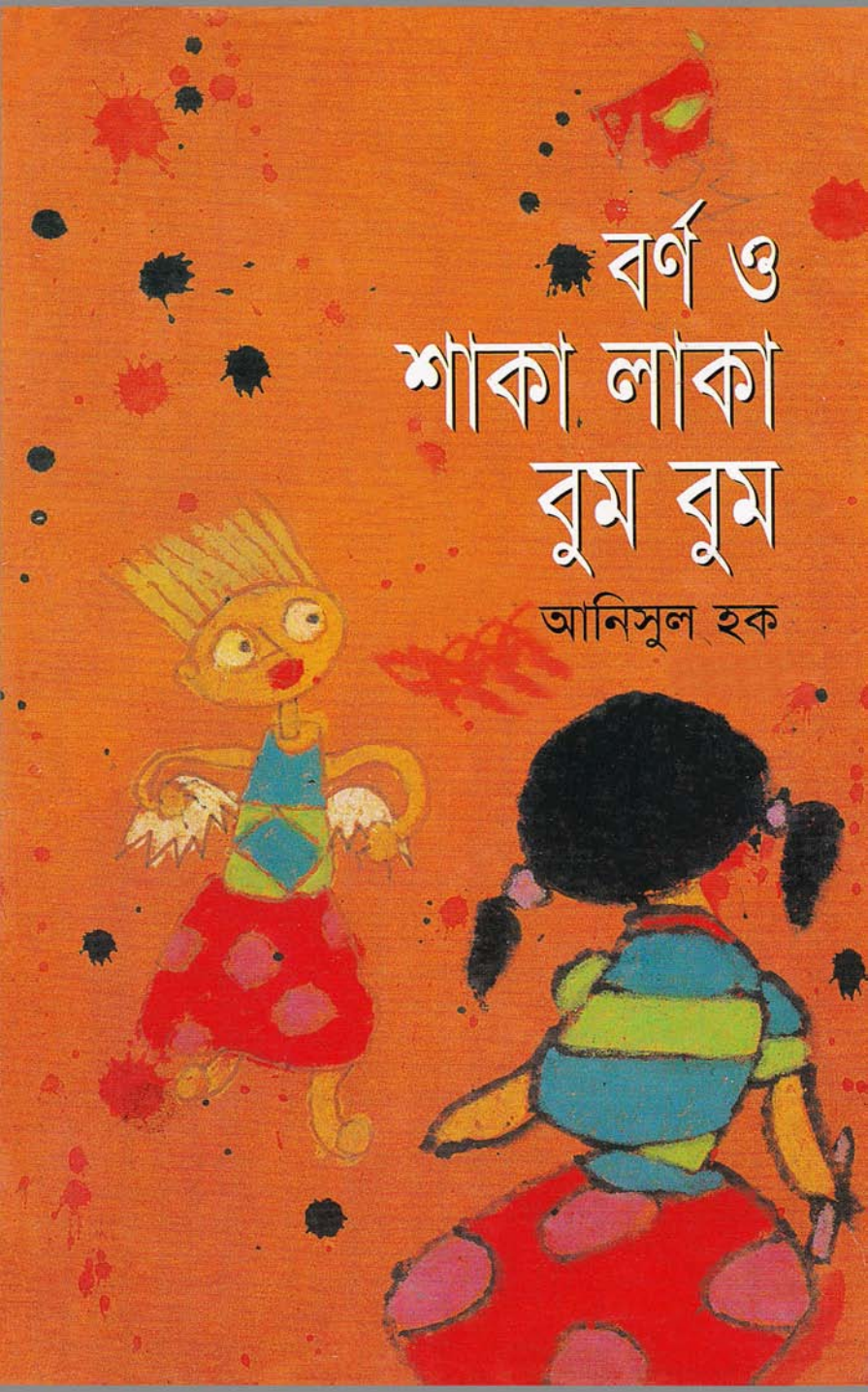

বর্ণ   ও

শাকালাকা বুমবুম

আনিসুল হক

বর্ণ ও শাকা লাকা বুম বুম

আনিসুল হক

ইতি প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩
© পারমিতা
প্রকাশক
মোঃ জহির দীপ্তি
ইতি প্রকাশন
৩৮/২খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৪৪০, ৭৪১৪৬০৬
মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
কম্পোজ
জীবন কম্পিউটারস্
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ
মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র
ISBN 984-864-017-7

উৎসর্গ

সৃজন, বর্ণ, সার্থক, পূর্ণ, প্রেরণা, প্রতীক্ষা,
অন্যতমা, বুমবুম ও পদ্য

সূচি

বর্ণ ও শাকা লাকা বুম বুম / ৯
ছেলেধরার কবলে ছোট্ট সাগর / ২২
পাশের বাসার পরীর মেয়ে /৩৪
তিতি ও মিতির গল্প / ৪৩

বর্ণ ও শাকা লাকা বুম বুম

টিভিতে শাকা লাকা বুম বুম দেখাটা বর্ণের নেশায় পরিণত হয়েছে। এ রকম একটা জাদুর পেন্সিল পেলে তো দুনিয়াটাই জিতে নেওয়া যায়। একটা ড্রয়িং খাতায় তুমি যা খুশি তাই আঁকো, তারপর বলো, শাকা লাকা বুম বুম, আর সঙ্গে সঙ্গে আঁকা ছবিটা সত্যিকারের জিনিসে পরিণত হয়ে যাবে। ধরো, তুমি আঁকলে একটা কলা, আর মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা হলুদ রঙের পাকা কলা হয়ে গেল। আহ্, কী সুন্দর কলার গন্ধ! ধরো, তুমি আঁকলে একটা চমৎকার স্কুলব্যাগ, আর বললে মন্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুলব্যাগটা তোমার সামনে প্রস্তুত। বিনা-পয়সায় একটা নতুন স্কুলব্যাগ তোমার হয়ে গেল।

বর্ণ এই সিরিয়ালটা দেখে, আর ভাবে, আহা, একটা জাদুর পেন্সিল যদি আমার কাছে থাকত।

ফেরদৌসী রহমান খালামণির একটা গান আছে, আমার থাকত যদি এমন একটা জাদুর পেন্সিল, তাতে যা আঁকা যায়, যদি সত্যি হতো, তবে হাতের মুঠোয় পেতাম যে ভাই বিশ্বনিখিল। বর্ণ এই গানটা শোনে, আর আফসোস করে। কবে তার এ রকম একটা পেন্সিল হবে।

সে তার বাবাকে বলে, বাবা, আমাকে একটা জাদুর পেন্সিল এনে দাও না।

বাবা হাসেন, জাদুর পেন্সিল পেলে তুমি কী করবে?

বর্ণও হাসে। বলে, বারে তুমি জানো না জাদুর পেন্সিল দিয়ে কী করে!

কী করে?

ছবি আঁকে।

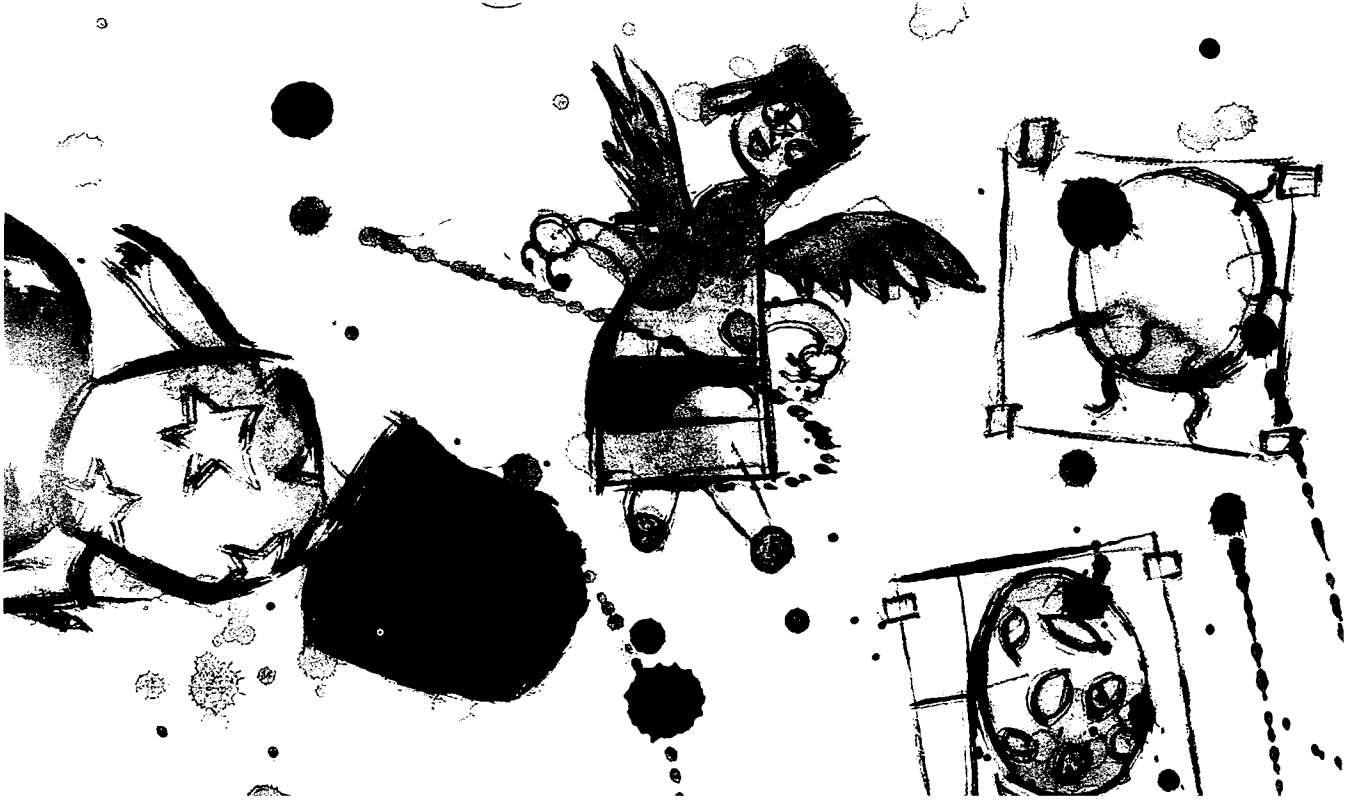

তুমি রোজ ছবি আঁকোই।

কিন্তু ওগুলো তো সত্যিকারের জিনিস হয় না। জাদুর পেন্সিল দিয়ে আঁকলে ওগুলো সব সত্যি হয়ে যেত।

বাবা বলেন, জাদুর পেন্সিল পেলে তুমি কীসের ছবির আঁকবে?

আইসক্রিমের।

বাবা হাসেন, ও তো তোমাকে আমি কিনে দিতেই পারি। এ জন্য তো পেন্সিল লাগে না। কিন্তু কিনে দেই না, কারণ তোমার একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে। আইসক্রিম ছাড়া আর কী আঁকবে বলো।

বর্ণ বলে, অনেক কিছু আঁকব। যখন যা দরকার পড়ে, তাই আঁকব। আর তাই হয়ে যাবে। ধরো, এখন আমার ইচ্ছা করছে, একটা ছোট্ট খেলনা মোটর গাড়ি চড়তে। ওই যে শিশুপার্কে আছে না, যেটাতে চড়ে পায়ে চাপ দিলে চলতে থাকে। ডানে ঘোরালে ডানে ঘোরে, বাঁয়ে ঘোরালে বাঁয়ে। ওটা আঁকব। তারপর ওই মোটর গাড়িটাতে চড়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াব।

বাবা হাসেন। বলেন, বাবা, তোমাকে আমি নিউ মার্কেট থেকে শাকা লাকা বুম বুম ছবির মতো দেখতে একটা পেন্সিল কিনে এনে দেব। কিন্তু বাবা, একটা কথা, ওই পেন্সিলটা কিন্তু জাদুর পেন্সিল হবে না। ওটা হবে একটা সাধারণ পেন্সিলই। শুধু দেখতে শাকা লাকা বুম বুমের পেন্সিলের মতো হবে।

বর্ণ কেঁদে ফেলে। কেন? না, আমি জাদুর পেন্সিল চাই। আমি শাকা লাকার পেন্সিলই চাই।

বাবা মুশকিলে পড়েন। আহ্!, কাঁদছ কেন? যা হয় না, তা আমি কোত্থেকে তোমাকে এনে দেব। অযথা জেদ করো না। তোমার বয়স এখন পাঁচ হচ্ছে। এখনও যদি তুমি এই জিনিসটা বুঝতে না পারো, কোন্‌টা গল্প কোন্‌টা সত্যি। ছি ছি ছি বর্ণ!

বর্ণ তবুও কান্না থামায় না।

মা ছিলেন রান্নাঘরে। তিনি এসে রেগে যান। বলেন,বর্ণ, কান্না থামাও। আর একটা শব্দ শুনলে দিব একটা চড়।

বর্ণ অতিকষ্টে কান্না থামায়।

বিকাল বেলা নিউ মার্কেটে গিয়ে বর্ণের বাবা বর্ণের জন্য একটা শাকা লাকা মার্কা পেন্সিল কিনে আনেন। সাধারণই একটা পেন্সিল। মাথায় ইরেজারটা একটু বড়, মুকুটের মতোন। সঙ্গে একটা ড্রয়িং খাতা।

ওই পেন্সিল আর খাতা পেয়েই বর্ণ বেজায় খুশি। সে মেঝেতে বসে পড়ে মনের আনন্দে ছবি আঁকতে শুরু করে দেয়। আর মনে মনে ভাবে, ছবিগুলো সব সত্য হয়ে যাচ্ছে। এই তো আঁকল একটা হেলিকপ্টার, আর ভটভট শব্দ করে একটা হেলিকপ্টার নামতে শুরু করল তার ছাদে। সে আঁকল একটা ছোট্ট খরগোস, আর ভাবতে লাগল, খরগোসটা তার ঘরময় ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। সে আঁকল একটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, আর গাড়িটা তার মেঝেতে চক্কর দিচ্ছে।

তারপর খাতা আর পেন্সিলটা বুকে জড়িয়ে ধরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল শাকা লাকা বুম বুমকে নিয়েই।

২

রাতের বেলা সে হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন তাকে ডেকে বলছে, বর্ণ, ওঠো। তোমার পেন্সিলটা তার জাদুকরি শক্তি পেয়ে গেছে।

বর্ণ ঘুম থেকে জাগল। পেন্সিলটা দেখতে পেল তার বুকের কাছেই পড়ে আছে। খাতাটাও।

সে খাতা-পেন্সিল নিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বাতি জ্বালিয়ে কার্পেটে বসে পড়ল। এখন সে যা আঁকবে, তাই কি সত্যি হবে! দেখা যাক পরীক্ষা করে! প্রথমে কী আঁকা যায়?

তখন তার খুব কান্না পেল। কারণ তার বয়স মাত্র পাঁচ, আর সে ভালো করে ছবিই আঁকতে পারে না। সে যদি গোল কিছু আঁকতে চায়, গোল হয় না। সে ভাবল, আমি একটা ফুটবল আঁকি। অনেক মন দিয়ে গোল একটা বল আঁকার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেটা গোল না হয়ে চ্যাপ্টা আর এবড়োথেবড়ো হয়ে গেল। তার ভেতরে সে পাঁচকোণা শাদা-কালো ব্লক দেওয়ার চেষ্টা করল। সেটাও খুব জুতসই হলো না। তারপর সে পড়ল

মন্ত্রটা, শাকা লাকা বুম বুম, সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এসে গেল একটা ফুটবল। কিন্তু সে সেটায় লাথি মারতে গিয়ে বুঝল, বলটায় পাম্প নেই। সে বুঝল, এটা তার ম্যাজিকের দোষ নয়, তার নিজের দোষ। সেই তো গোল করে বলটা আঁকতে পারেনি।

এর চেয়ে একটা গোল আলু আঁকি। এটাকে গোল আঁকতে হবে না। বর্ণ বহুত কষ্ট করে একটা গোল আলুর মতো আঁকল। তারপর বলল, শাকা লাকা বুম বুম। অম্নি একটা বেঢপ গোল আলু তার সামনে এসে গেল।

তাহলে আমি একটা রসগোল্লা আঁকি না কেন? ওটাও তো খুব বেশি গোল নয়। সে একটা প্রায় গোল গোল্লা এঁকে ফেলল। কিন্তু এটা যে রসগোল্লা সেটা বোঝানো যাবে কী করে?

আচ্ছা দেখাই যাক না, শাকা লাকা বলে, কী হয়। সে বলল, সাকা লাকা বুম বুম আর অম্নি একটা ছোট্ট নুড়িপাথর এসে গেল তার সামনে। বর্ণ বুঝল ঘটনা কী! সে আঁকতে চেয়েছে রসগোল্লা, আর এঁকেছে নুড়িপাথরের মতো একটা কিছু। তাই এটা এসেছে। ঠিক আছে এবার সে কাপ-পিরিচ আঁকবে। তার মুশকিল হলো, সে আঁকতে জানে খুব অল্পসংখ্যক জিনিস। কাপ পিরিচটা সে একটু একটু পারে। সে একটা কাপ আর নিচে একটা পিরিচ এঁকেই ফেলল। কিন্তু বাস্তবের পিরিচ তো এ রকম আঁকাবাঁকা হয় না। শাকা লাকা বলার পরে তার সামনে যে কাপ আর পিরিচটা এলো, সেগুলো নড়বড় করছে। কারণ তলা সমান নয়। আর কাপটা পিরিচে ঠিকমতো বসছেও না।

যা হোক, এটাতে চা খাওয়া না যাক, খেলনা হিসেবে তো এটা ব্যবহার করা যাবে।

এবার কিছু পশুপাখি আঁকার চেষ্টা করলে কী হয়। সে একটা পাখিই শুধু আঁকতে পারে। এই পাখি আঁকার সময়ে একটা ছড়া বলতে হয়

হাঁটু ভাঙা দ টি
বসতে দিলাম পিঁড়িটি
জ্বর হলো ডাক্তার এল ২২টি
খেতে দিল বড়িটি
মুড়িয়ে দিলাম কাঁথাটি
একটানে হয়ে গেল টিয়াপাখি

বর্ণ এই ছবিটা আঁকল। তারপর ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চিত হলো, এই পাখি আর যাই হোক, টিয়াপাখি নয়। এখন শাকা লাকা বুম বুম বললে কি টিয়াপাখি আসবে, নাকি অন্য কোনো পাখি।

বর্ণ শাকা লাকা মন্ত্র পড়ে ফেলল। এবার টিয়া পাখির বদলে এলো একটা কাপড়ের তৈরি পাখি। বর্ণ খুশি। কারণ এই পুতুলটা নিয়েও তো খেলা যাবে।

কিন্তু সত্যিকারের জ্যান্ত কোনো প্রাণী সে কি এখন এইখানে তার ঘরের ভেতরে জাদুবলে আনতে পারবে না? আনা যেত, যদি সে একটা বিড়াল কি কুকুর কি একটা খরগোস আঁকতে পারত। সে টেডিবিয়ার আঁকতে পারে বটে, কিন্তু এখন এই ঘরে একটা ভালুক এসে গেলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। বিছানায় মা ঘুমুচ্ছেন, তারও বিপদ হবে।

তারচেয়ে একটা লজেন্সের ছবি আঁকলে কী হয়? সে একটা মোড়কে মোড়ানো লজেন্স আঁকার চেষ্টা করল, ধুত্তুরি ছাই হলোই না। এখন শাকা লাকা বুম বুম বললে কী দাঁড়াবে? আচ্ছা বলেই দেখি।

বর্ণ মন্ত্রটা পড়েই ফেলল। আর তার সামনে যা এলো, সেটা যে কী বস্তু, বর্ণ জানে না। আসলে সেটা ছিল একটা চকলেট পটকা। রাংতায় মোড়ানো। এটাকে আছাড় মারলে জোরে শব্দ হবে। তবে এটা খাওয়ার চেষ্টা করলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখন বর্ণ তো আর জানে না, জিনিসটা কী? সে জিনিসটার মোড়ক খুলে দেখল। একটুখানি জিভে ছুঁয়ে স্বাদ নিয়ে দেখল, না, এটা ঠিক খাওয়ার জিনিস নয়।

তাহলে কি সে কোনো একটা খাবার জিনিস আঁকতে পারবে না? আচ্ছা একটা আপেল তো সে আঁকতে পারে। সেটা আঁকাই তো মনে হয় সবচেয়ে সহজ হবে।

বর্ণ এবার একটা আপেল আঁকতে লেগে গেল। আর আপেল জিনিসটা এতই মার্কামারা যে যতই আঁকাবাঁকা হোক না কেন, ছবিটাকে ঠিক আপেল বলেই চেনা যাচ্ছে। এইবার তুমি যাবে কোথায়?

শাকা লাকা বুম বুম।

আহ্! একটা সত্যিকারের আপেল এসে গেল সামনে। এটা মনে হয় খাওয়া যাবে। সে শুঁকে দেখল, আপেলের গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে। এটায়

একটা কামড় দেওয়া যায়। কিন্তু খাওয়ার আগে ফলটা ধুয়ে নেওয়া দরকার। সে এখন পানি পাবে কোথায়। ডাইনিং টেবিলে পানির জগ আছে। সে নিজে নিজে গেল ডাইনিং টেবিলে। পানির জগটা থেকে গেলাসে পানি ঢালতে গিয়েই হলো যত গণ্ডগোল। হাত থেকে পড়ে গেল জগটা। আর সমস্ত টেবিলে পানিতে সয়লাব তো হলোই, গেলাসটা ছিটকে পড়ে গেল ভেঙে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাচ।

হায় হায় এখন কী হবে। বর্ণর সমস্তটা গা ভিজে জবজবে।

মা যদি উঠে দেখে ফেলেন এসব, কী বকাটাই না দেবেন। এক-আধটা মার পিঠে পড়াও বিচিত্র নয়। ছু। এখন সে করবেটা কী?

সে ডাইনিং টেবিলের পাশ থেকে সরে নিজের ঘরে আসে। তারপর তোয়ালে খোঁজে। দরজার কবাটের সঙ্গে তোয়ালে ঝুলছে, তার নাগালের বাইরে। কাপড়চোপড় পাল্টানো দরকার।

উফ। বর্ণও এখন করবেটা কী? আচ্ছা, একটা কাজ করি না কেন! একটা পরী আঁকি। ভূত-পেত্নি খারাপ হতে পারে, পরীরা কখনও খারাপ হয় না। যা ভাবা তাই কাজ। বর্ণ তার খাতা আর পেন্সিল নিয়ে লেগে পড়ল। একটা পরীর ছবি আঁকতে। সে প্রথমে আঁকল একটা গোল। তাতে দুটো ফোঁটা দিয়ে সে আঁকল চোখ। একটা খাড়া ছোট্ট টান দিয়ে নাক। তার নিচে একটা ছোট্ট দাগ টানলে সেটা হলো মুখ। মাথার মধ্যে এখন বড় বড় চুল আঁকতে হবে। সে পেন্সিল দিয়ে দাগ টেনে টেনে চুল এঁকে চলল। তারপর জামা আঁকার প্রচেষ্টা চলল। জামার পরে হাত আর পা। ভালোই হয়েছে মেয়েটা। খারাপ নয়। এবার আঁকতে হবে পরীর আসল জিসিনটা। দুটো ডানা। দু কাঁধের ওপরে সে এঁকে দিল দুটো পাখা। ব্যস হয়ে গেল পরী।

এবার তার মন্ত্র পড়ার পালা।

সে চোখ বন্ধ করে বলল, শাকা লাকা বুম বুম।

অমনি একটা ছোট্ট পরীর মেয়ে তার সামনে এসে হাজির। সে তারই সমান। ফরসা ধবধবে গা। তার ছবির মতোই খাড়া খাড়া চুল। যেন খড়বিচালি দিয়ে এই চুল বানানো। ছোট্ট দুটি চোখ কিন্তু খারাপ লাগছে না।

বর্ণ বলল, তুমি কি পরী?

সে বলল, হ্যাঁ। আমি পরী।

তোমার নাম কী?

আমার নাম মধুবন্তী।

তুমি থাকো কোথায়?

তোমার মনের মধ্যে।

ধেত্তেরি, এ আবার কেমন কথা?

বারে তুমি আমাকে এঁকেছ। তারপর জাদুমন্ত্র দিয়ে আমাকে বানিয়েছ। তাই না।

বর্ণ ভেবে দেখল, কথা ঠিক। সে বলল, মধুবন্তী, তুমি কি উড়তে পারো?

পারি।

তুমি কি আমাকে ওই তোয়ালেটা পেড়ে দেবে?

দেব।

দাও না!

মধুবন্তী ডানা মেলে ধরল। তার পা উঠে গেল মেঝে থেকে। সোজা উড়ে গেল দরজাটার কাছে। তোয়ালেটা হাত দিয়ে পেড়ে নিয়ে উড়ে উড়ে চলে এলো বর্ণের কাছে। তারপর নিজের হাতে বর্ণের গা-হাত-পা দিতে লাগল মুছে। বলল, তোমার কাপড়চোপড় তো ভেজা। এই কাপড় পাল্টাতে হবে।

বর্ণ বলল, আমি নিজে নিজে কাপড় পরতে পারি না। আর তুমি আমাকে কাপড় পরিয়ে দিলেও আমার লজ্জা লাগবে।

মধুবন্তী বলল, তাহলে তো তোমার কপালে দুঃখ আছে। তোমার তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

বর্ণ বলল, আমার ঠাণ্ডা লেগেই গেছে। এই যে এখনই হাঁচি আসবে।

পরী বলল, এই হাঁচি দেবে না খবরদার। আমি মানুষের হাঁচি সহ্য করতে পারি না।

বর্ণ বলল, হাঁচি এলে আমি থামাব কেমন করে!

পরী বলল, দাঁড়াও, তোমার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আমার একটা জাদুর লাঠি আছে। সেটা দিয়ে তোমার গা বুলিয়ে মন্ত্র পড়ব। আর মনে মনে যা চাইব, তাই হবে।

তাহলে তাই করো মধুবন্তী।

মধুবন্তী তার জামার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট কাঠি বের করল। সেটা বর্ণের মাথায় বুলিয়ে মন্ত্র পড়তে না পড়তেই বর্ণের গায়ে চলে এলো নতুন কাপড়-চোপড়।

বর্ণ খুব খুশি। এই পোশাকটা বেশ আরামের। তার আর ঠাণ্ডা লাগছে না। হলে কী হবে, তার হাঁচিটা ঠিকই এসে গেল। যেই না সে হ্যাচ্চে বলেছে, অম্নি সে দেখতে পেল, তার সামনে থেকে পরীর মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। বর্ণ খুব মন খারাপ করল। এই পরীর মেয়েটাকে দিয়ে আরো কিছু জাদুর জিনিস সে আনিয়ে নিতে পারত। ছু।

তখন তার মনে পড়ল, আরে আরে, আমি ভাবছি কেন! আমার তো জাদুর পেন্সিল আছেই। এটা দিয়ে তো আমি আবার পরীর ছবি আঁকতে পারি। তাহলে তো আবার পরীটা এসে যাবে।

বর্ণ পরীর ছবি আঁকতে লাগল। কিন্তু এবার পরীর মুখটা আর গোল হলো না। বরং হলো পাশে চ্যাপ্টা। পাখা দুটো হয়ে গেল বেশি বড়। আর একটা পাখা হলো ছোট, আরেকটা বড়।

বর্ণ মন্ত্র পড়ল শাকা লাকা বুম বুম।

অমনি তার সামনে পরী এসে গেল। তবে আগের পরীটা নয়। এটার পাখা দুটো বড়, আর একটা পাখা বড়, আরেকটা ছোট। ফলে এর উড়তে অনেক কষ্ট হচ্ছে।

পরী এসে বলল, এই তুমি আমার পাখা দুটো সমান করে আঁকোনি কেন?

বর্ণ বলল, আমি তো ছোট। আমার ছবি আঁকার হাত এখনও তেমন ভালো হয়নি।

পরী বলল, তা বললে তো হবে না। তুমি শাকা লাকার পেন্সিল হাতে নিয়ে বসে থাকবে, যাকে ইচ্ছা তাকে আঁকবে, আর আঁকার সময় খারাপ করে আঁকবে, তা চলবে না। এখন আমি আমার এই অসমান পাখা নিয়ে তো উড়তে পারছি না। ডানায় খুব ব্যথা করছে।

আমি স্যরি।

স্যরি বললে চলবে না।

এক কাজ করি, তোমার বড় পাখাটা একটু কেচি দিয়ে কেটে দেই।

তুমি বলে ছবিই ঠিকমতো আঁকতে পারো না, তুমি পাখা ছাঁটতে গিয়ে আমাকে ব্যথা দেবে।

তাহলে এখন আমি কী করতে পারি?

তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই তোমার একটা পা ছোট করে দেব। তারপর দেখি তুমি কেমন করে হাঁটো।

ছোট করে দেবে? কীভাবে?

কেটে ছোট করব!

ইস আমার লাগবে না? রক্ত বের হবে না? পা কি আর পাখনা যে কাটা যাবে?

ঠিক আছে, তাহলে একপা লম্বা করে দেব।

কী করে?

টেনে।

না না পরী তুমি এ কাজ করো না।

না, আমি করবই।

এই নতুন বদরাগী পরীটা যেই না বর্ণের কাছে এসে ওর পায়ে হাত দিতে গেছে, অম্নি বর্ণ দিল একটা হাঁচি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এই পরীটাও গায়েব।

বর্ণ দেখল পরিস্থিতি খুবই জটিল। ডাইনিং টেবিলের একটা শুকনো অংশে খাতা রেখে সে কয়েকটা জগ আঁকল। আর কয়েকটা গ্লাস। সে সব যে দেখতে খুব ভালো হলো তা নয়।

আঁকাবাঁকা হলো জগের ওপরটা, নিচটা, চারপাশও। গেলাসগুলোর অবস্থাও একই রকম শোচনীয়। কিন্তু বর্ণ কী আর করবে। এরচেয়ে ভালো কিছু আঁকার তো আর সাধ্য নেই। এসব সামনে নিয়েই সে মন্ত্র পড়ল: শাকা লাকা বুম বুম।

আর তার সামনে টেবিল জুড়ে এসে গেল কতগুলো আঁকাবাঁকা জগ আর গেলাস।

না, আজ আর নয়। বর্ণ ভাবল, এখন ঘুমিয়ে পড়া দরকার। ভাগ্যিস মা টের পাননি।

বর্ণ আবার তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে বর্ণ দেখল, তার বালিশের কাছে ড্রয়িং খাতা আর এক পাশে শাকা লাকা পেন্সিল পড়ে আছে। তাহলে কি সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল?

তাই হবে।

সে ডাইনিংরুমে গেল। দেখতে পেল শোকেসের ওপরে কতগুলো অদ্ভুত ডিজাইনের গেলাস আর জগ। এগুলো কোথা থেকে এসেছে, মা কোনো প্রশ্নই করছেন না। এসব যে সে রাত্রিবেলা জাদুর পেন্সিল দিয়ে এঁকে এনেছে, মা তো সেটা জানেনই না। শেষে সেই মাকে বলল, মা, এই রকম আঁকাবাঁকা জগ-গেলাস কোথেকে এলো?

মা বললেন, কেন, কালকে সন্ধ্যায় তোর বড় মামা দিয়ে গেল না। মিসর থেকে এনেছে। ভারি মজার না ? আঁকাবাঁকা হওয়াতেই বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে জগ আর গেলাসগুলোকে।

বর্ণ চিন্তায় পড়ল। মামা মিসর থেকে সন্ধ্যায় এসেছেন? তাহলে সে যে রাত্রিবেলা শাকা লাকা পেন্সিল দিয়ে এঁকে জিনিসপত্র আনল, সেসব গেল কোথায়? তাই তো অন্য জিনিসগুলোও তো দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সে স্বপ্নই দেখেছে। স্বপ্নে এ ধরনের উল্টাপাল্টা ব্যাপার অনেক ঘটে। একদিন স্বপ্নে দেখল সে বাথরুমে গিয়ে ঠিক জায়গাতেই হিসু করছে, কিন্তু একটু পরে যখন স্বপ্ন ভাঙল তখন সে বুঝতে পারল সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে বিছানাতেই হিসু করে দিয়েছে।

কিন্তু একটা কথা তো ঠিক, ছবিটা সে ঠিকমতো আঁকতে পারে না। সে পড়ে কেজি ওয়ানে। ড্রয়িং ক্লাসে সে সব সময় এনআই পায়। মানে নিড টু ইম্প্রুভ। আরো ভালো করতে হবে। ছবি আঁকার এমন হাত নিয়ে সে যদি একটা সত্যিকার শাকা লাকা মার্কা জাদুর পেন্সিলও পায়, কোনো লাভ নেই।

সে কিছুতেই ছবি এঁকে সত্যিকারের কোনো জিনিস আনতে পারবে না। কারণ তার ছবি সত্যিকারের ছবির মতো হয় না।

সে মাকে বলল, মা, জাদুর পেন্সিল বলতে কি আসলেই কিছু আছে?

মা হেসে বললেন, না, বাবা।

বর্ণ এবার গেল বাবার কাছে, বাবা, এমন কি কখনও হয়, একজন মানুষ যা আঁকল, তা সত্য হয়ে যায়।

বাবা বললেন, না বাবা। তা হয় না। তবে কোনো মানুষ আছেন, বড় শিল্পী, তারা ছবি দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করেন। তুমি যদি ভালো ছবি আঁকা শেখো, বড় আর্টিস্ট হও, তাহলে তোমার পেন্সিল, তোমার তুলি জাদুর চেয়েও ভালো কাজ করবে।

বর্ণ বলল, আমাকে ছবি আঁকার ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দাও। আমি ছবি আঁকা শিখব।

মা তাকে একটা আর্টের ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সে আর্টের স্যারকে বলল, স্যার আমি এমন ছবি আঁকতে চাই, যা দেখে মনে হবে, সত্যিকারের। মাছের ছবি যদি আঁকি, সত্যি ভেবে বিড়াল সেটার ওপরে হামলা চালাবে।

স্যার বললেন, ভালো ছবি মানে সব সময় ফটোর মতো সুন্দর ছবি নয়। ফটোর মতো ছবি চাইলে তো ফটো তুললেই হয়। তবে হ্যাঁ, যাঁরা বড় আর্টিস্ট হন, তাঁরা সবাই ড্রয়িংটা খুব ভালো পারেন। ড্রয়িং খারাপ হলে কোনো আশা নাই। জয়নুল আবেদিন ভালো ড্রয়িং পারতেন, কামরুল হাসান ভালো ড্রয়িং পারতেন।

বর্ণ বলল, স্যার বড় আর্টিস্টরা নাকি স্যার পেন্সিল দিয়ে তুলি দিয়ে ম্যাজিকের চেয়েও বড় কাজ করতে পারেন?

স্যার হেসে বললেন, হ্যাঁ পারেন। সে তো তুমি এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে। জয়নুল আবেদিন ছবি দিয়ে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, কামরুল হাসান ছবি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। দুনিয়ার আরো বড় বড় আর্টিস্ট ছবি দিয়ে বড় বড় ম্যাজিকের কাজ করেছেন।

বর্ণ স্যারের কথা কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। তবে সে খুব তাড়াতাড়ি ছবি আঁকায় খুব ভালো করতে লাগল।

সাত বছর পরের ঘটনা। ২০০৯ সাল। বর্ণের বয়স এখন বারো বছর। সে একটা আন্তর্জাতিক ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ফার্স্ট হয়েছে। পুরস্কার নিতে

যেতে হবে জাপানে। তার সাথে তার একটা বন্ধুও যাবে। বন্ধুটা পাবে একটা রৌপ্য পদক। তার নাম তুহিন।

জাপানে গিয়ে হলো মুশকিল। কারণ জাপানিরা ইংরেজি জানে না। একদিন রেস্তরাঁয় খেতে বসে তারা কী অর্ডার দেবে কিছুই বুঝছিল না। তখন বর্ণ বলল, আয়, আমরা শাকা লাকা বুম বুম খেলি।

তুহিন বলল, শাকা লাকা... সেটা আবার কী?

তোর মনে নেই, ওই যে একটা ছবি হতো টিভিতে। যা আঁকা যায়, তাই সত্যি হয়ে যায়!

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে।

এখন আমি সেই খেলাটা খেলব। পেন্সিল দিয়ে যা আঁকব তাই সত্যি হবে।

কেমন?

বর্ণ পেন্সিল কাগজ নিয়ে আঁকল দুটো মুরগির রান। কয়েকটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আর আঁকল একটা রূপচাঁদা মাছ। তারপর ওয়েটারকে দেখিয়ে বলল, শাকা লাকা বুম বুম

একটু পরে ওয়েটার মুরগির রান ভাজা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর রূপচাঁদা মাছ ভাজা নিয়ে এলো।

কেমন দেখালাম? বর্ণ বলল।

তুহিন বলল, জব্বর। ভাগ্যিস তুই ভালো ছবি আঁকতে পারিস। তাই না আজকে অর্ডার দিতে পারলাম। নাহলে তো না খেয়েই মরে যেতে হতো।

ছেলেধরার কবলে ছোট্ট সাগর

সাগরের বয়স ৭ কি ৮ বছর। সে ঢাকার একটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বিকালে বেরিয়েছিল দাদার সঙ্গে। দাদা বিকালে হাঁটেন, স্বাস্থ্যের সন্ধানে। সাগর তাকে সাহচর্য দেয়।

সাগর দাদার সঙ্গে হাঁটছে। তার পরনে একটা লাল রঙের টি-শার্ট, হাফপ্যান্ট আর পায়ে কেড্‌স। তারা একটা রেল লাইনের পাশ দিয়ে হনহন করে হাঁটছে। এই পথ দিয়ে হাঁটার সুবিধা হলো তোমার গায়ে গাড়িঘোড়ার উঠে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

পিলপিল করে এ পথ দিয়ে লোকেরা ছুটছে পিঁপড়ার মতো।

সামনে একটা জায়গায় টিলা। একটা মধ্যবয়স্ক লোক, গরিব ধরনেরই, কাঁদছে। হাউমাউ করে। তার পরনে লুঙ্গি। গায়ে একটা মলিন গেঞ্জি। মুখে কালো কালো দাগ। চুল উস্কোখুশকো।

দাদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, কাঁদছেন কেন?

লোকটা যা বলল, তার সরলার্থ হলো, তিনি এই পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। সঙ্গে ছিল তার শেষ সম্বল ৪০০টি টাকা। এটা নিয়ে গ্রাম থেকে তিনি শহরে এসেছেন কাজের সন্ধানে। এখানে ওই যে টেবিলটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা তাসের খেলা হচ্ছে। তিন তাসের খেলা। একটা আছে সাহেব, একটা বিবি, একটা গোলাম। ব্যস, এই তিনটা তাস। আর কিছু নয়। তাস তিনটাকে ওরা দুভাগ করে। একটা ভাগে পড়ে দুটো তাস, আরেকটা ভাগে

একটা। আপনাকে বলতে হবে সাহেবটা কোন্ ভাগে পড়েছে। আপনি টাকা রাখলেন টেবিলে, যদি বলতে পারেন কোন্ ভাগে সাহেব আছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পাবেন তিনগুণ টাকা। আর যদি না পারেন, পুরো টাকাটাই মার যাবে। লোভে পড়ে গ্রাম থেকে আসা এই লোক এই খেলা খেলেছে। খেলে সে চারশ টাকাই হেরেছে। এখন সে সর্বস্বান্ত।

লোকটার কান্না দেখে মায়া হবে না, এমন লোক দুনিয়াতে কমই আছে।

দাদারও মায়া হলো। তিনি এগিয়ে গেলেন পেতে রাখা টেবিল আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবকের কাছে। যুবক দুটোও লুঙ্গি পরা। তাদের চেহারা গুণ্ডা প্রকৃতির। তবে তাদের হাতে ঘড়ি। গলায় চেইন। মুখে সিগারেট। কাছেই একটা ক্লাবঘর দেখা যাচ্ছে। তাতে সাইনবোর্ড ব্যায়ামবীর সমাজসেবক ক্লাব।

দাদা বললেন, আপনারা এই লোকের টাকা নিয়েছেন কেন? দিয়ে দেন।

যুবকেরা বলল, আরে আমরা নিমু ক্যান? হে তো খেইলা হারছে। আপনে খেলেন। খেইলা জিতা তার ৪০০ টাকা উদ্ধার কইরা দেন।

কী খেলা দেখি। দাদা বললেন।

যুবকেরা খেলার নিয়ম দেখাল। খুবই সোজা। এই যে সাহেব, কিং, এই তাসটা কোন্ ভাগে পড়ল, শুধু এইটা বলবেন। মাত্র তিনটা তাস। দেখেন, আপনার সামনে রাখতেছি। এই যে সাহেব, দেখেন, এইটা কোন্ ভাগে পড়ল। এই ভাগে। ব্যাস। খালি এইটা বলবেন। আপনে ১৫০ টাকা বাজি ধরেন। জিতলেই সাড়ে চারশ পাইবেন। ওনারে দিয়া দিবেন ৪০০। ৫০ টাকা আপনের লাভ। আহা বেচারা গরিব মানুষ। ওনার জন্যে মায়া লাগতেছে। নেন আংকেল। আপনে দেড়শটা টাকা বাজি ধরেন। নেন।

দাদা দেখেন, ছেলেগুলো তো ন্যায্য কথা বলেছে। তারা খেলে জিতেছে। সে-টাকাটা আপনাআপনি তারা ফেরত দিতে পারে না। সহজ একটা খেলা, তিনি তো সহজেই বাজি ধরে জিতে নিতে পারেন।

দাদা প্রথমে বাজি ধরেন ১৪০ টাকা। ভালো করে লক্ষ্য করছেন লোকটার হাতে ধরা তাসের দিকে। সাহেবটা কোথায় রাখে। ওই তো সাহেবটা।

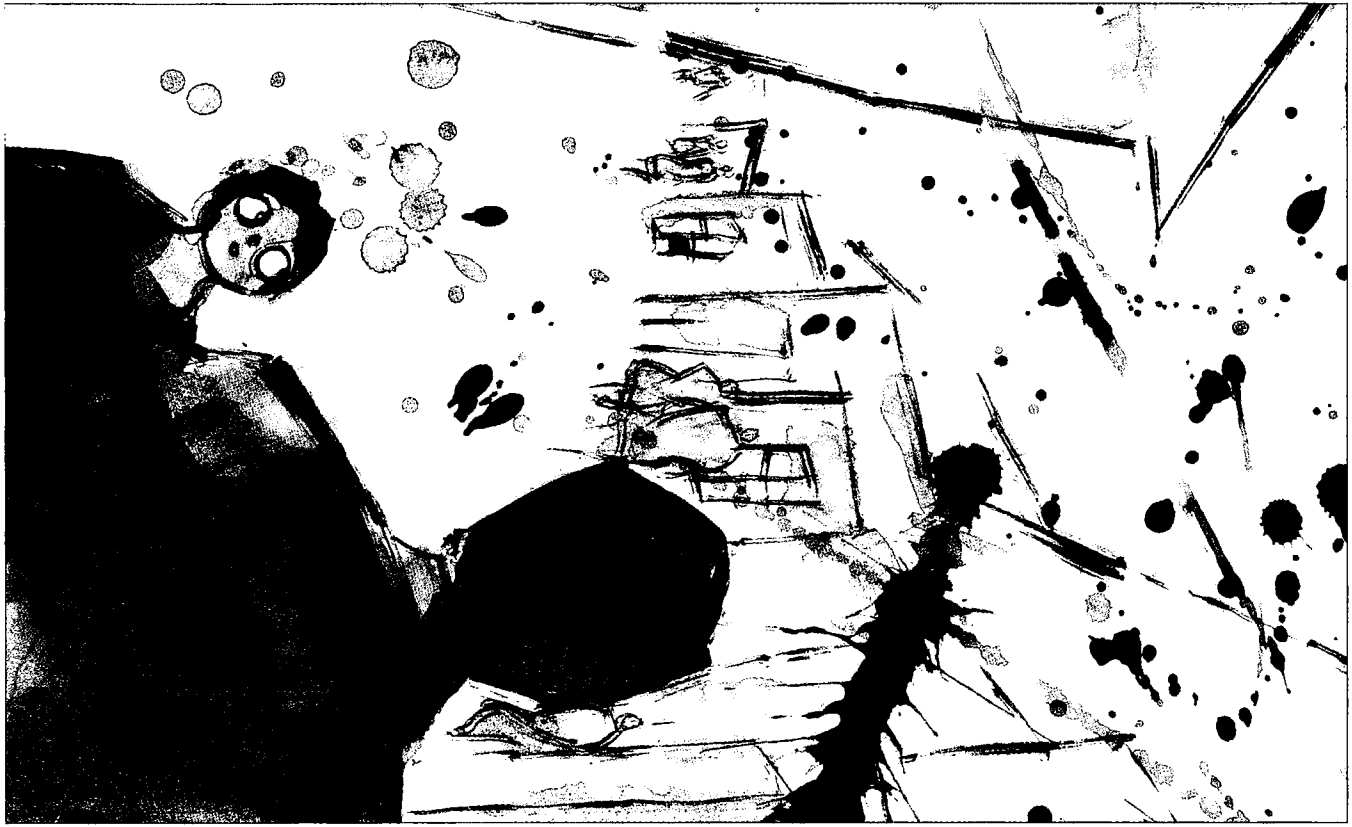

এই যে এইটা সাহেব। দাদা বলেন। লোকটা কার্ড ওল্টায়। না মেলেনি। আশ্চর্য তো, মিলল না কেন। ততক্ষণে ১৪০ টাকা যুবকটা তার পকেটে ভরে ফেলেছে। এবার?

যুবক উৎসাহ দেয়। আরে চাচা, আপনে ভুল করলেন কেমনে? এই যে সাহেব। নেন, একটু ছিঁইড়া রাখেন। চিহ্ন থাকল। এইবার ধরেন। বেশি কইরা ধরেন। একবারে আপনের টাকা তার টাকা সবই যেন ওঠে। দাদার পকেটে একটা ৫০০ টাকার নোট ছিল। তিনি সেটাই বাজি ধরেন। চিহ্ন তো দেওয়াই আছে। এবার তো হারবেন না।

না, আশ্চর্য যে এবারও তিনি জিততে পারেন না।

সাগর বলে, দাদা, চলো তো।

দাদা ভাবেন, আরে মিলল না কেন?

যুবকেরা বলে, আরে আপনারে দেখায়া দিলাম না এইটা সাহেব, এই যে কান্নি ছিঁইড়া রাখছি। এটা আপনি কী করলেন। নেন আবার ধরেন। এবার সিয়োর জিতবেন।

কী ধরবেন? হাতে ঘড়ি আছে। এইটা ধরেন। কত দাম। আড়াই হাজার। আচ্ছা জিতলে সাড়ে সাত হাজার দিমু। এই সবাই সাক্ষী থাকো।

দাদা এবার ঘড়িটাও হারেন। তখন তার হুঁশ হয় যে তিনি কোনো একটা প্রতারক চক্রের হাতে পড়েছেন, আর এমন একটা খেলা নিয়ে তারা বসেছে, যেটা লোভকে উস্কে দিতে চায়। দাদা ক্ষেপে যান, বলেন, আরে বেটা, এই লোকের চারশ টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য আমি খেলেছি। আর তোমরা আমাকে ফকির বানালে। ভুয়া সব। নিশ্চয় হাতের কারসাজি আছে। ভেল্কিবাজি। দাও আমার টাকা ফেরত দাও।

ওরা হইহই করে ওঠে। সাগরের ভয় লাগছে। ওরা মনে হচ্ছে সংখ্যায় অনেক। দাদাও প্রচণ্ড রেগে গেছেন। এক যুবকের কলার চেপে ধরেছেন। ওরাও দাদাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরেছে। তাকে নিয়ে যাচ্ছে ক্লাবঘরের পেছনের দিকে।

সাগর বোঝে এখানে থাকা ঠিক হবে না। সে দৌড় ধরে। তখন দুটো লোক চিৎকার করে ওঠে: ধর শালা পিচ্চিটাকে ধর।

সাগর পেছনের দিকে তাকায়। সত্যি সত্যি তাকে ধরতে দুজন ছুটে আসছে।

সাগর চোখ বন্ধ করে ছুটে চলে আসে বড় রাস্তায়। তার সমস্ত শরীর হাঁপিয়ে ওঠে।

বুক কাঁপছে যেন হাতুড়ি পড়ছে।

সে পেছনে তাকিয়ে দেখে গুণ্ডাগুলো কেউ নেই। সে দৌড়ানো বন্ধ করে বড় রাস্তার জনারণ্যে মিশে যায়।

২

সাগর একা একা হাঁটছে।

ফুটপাত জুড়ে কতকিছু। পসরা সাজিয়ে বসে আছে ফেরিওয়ালারা। কাগজের দোকান। ভিখিরি। লোকজন। রাস্তায় যানবাহন। দুধারে দোকানপাট অফিস আদালত। সে আরেকবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে না, তাকে ধরতে গুণ্ডাগুলো আসছে না।

সে প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার স্টান্ডে বই দেখে। অনেক কমিক্সের বই দেখা যাচ্ছে। নন্টে-ফন্টে থেকে শুরু করে টিনটিন। কিনতে পারলে ভালো হতো। এরপর সে আবার একমনে একদিকে হাঁটতে শুরু করে।

বাড়ি ফেরার রাস্তাটা মনে হয় এইদিকে হবে। সে একটা দিক বেছে নিয়ে চলতে থাকে।

একটা আইসক্রিমের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে কতগুলো ছেলেমেয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে। দেখে তার ভারি লোভ হয়। আর দোকানের বাইরে বড় বড় আইসক্রিমের ছবিগুলোও কী মারাত্মক। সে দোকানের সামনে একটা লাইটপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা পড়ে থাকা কাগজ তুলে নিয়ে ফুটপাতে বসে একটা রকেট বানায়। তারপর সেটা ওড়াতে থাকে।

একজন ভদ্রলোক তাকে ফলো করেন। ব্যাপার কী, এই বয়সের একটা ছেলে, ভদ্রঘরের বলেই মনে হচ্ছে, রাস্তায় একা কেন?

তিনি এগিয়ে আসেন, বলেন, বাবু কী হয়েছে? তোমার বাড়ি কই? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ নাকি? চলো তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেই। তোমার বাড়ি কোথায়?

'আমার বাসা কোথায় আমি আপনাকে বলব না। বললে আপনি আমাদের বাসায় গিয়ে টাকা চাবেন'– সাগর বলে। কিছুদিন আগে সে টিভি চ্যানেলের খবরে দেখেছে, শিশুদের অপহরণ করে বাজে লোকেরা টাকা আদায় করে।

'ওরে বিচ্ছু। যা বাবা তোর বাসায় তুই একাই যা। আমার আর সেধে বিপদের মধ্যে পড়ার দরকার নাই'– ভদ্রলোক জিভে কামড় দেন।

'শোনেন, যাচ্ছেন কই? খবরদার যাবেন না'– সাগর বলে।

'যাবো না। কেন?'

'আমাকে আইসক্রিমের দোকানে নিয়ে গিয়ে আইসক্রিম কিনে দেন।'

'কেন?'

'আমার খেতে ইচ্ছা করছে, তাই।'

'তোমার খেতে ইচ্ছা করছে, আমি কেন দেব।'

'না দিলে আমি চিৎকার করব। বলব, আপনি ছেলেধরা! করব চিৎকার? করব?'

'হায় হায় এতো সাক্ষাৎ বিচ্ছু।'

'হুঁ। চলেন আইসক্রিমের দোকানে।'

'চলো।'

তারা আইসক্রিমের দোকানে ঢোকে। ভদ্রলোক সাগরের জন্য আইসক্রিম অর্ডার দেন।

'তোমার নাম কি?'

'নাম বলব না

'কেন বলবে না কেন?'

'বললে যদি আপনি আমার বাসার ঠিকানা বের করে ফেলেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। আমি তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

'আমাকে বোকা পেয়েছেন। আপনি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন, না চাঁদা চাইবেন, আমি জানি!'

'ঠিক আছে বাবা নাম বলতে হবে না।' ভদ্রলোক আবার নিজের জিভে নিজে কামড় দেন। মনে হয় এটা তার মুদ্রাদোষ।

৩

দাদা ব্যায়ামবীর ক্লাবের গুণ্ডাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যান স্থানীয় ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে। তখন তার শরীরে এখানে-ওখানে কেটে গেছে। পাঞ্জাবির একটা পাশ ছেঁড়া। তিনি সেখানে গিয়ে যোগাড় করেন ফোন নম্বর। তারপর ফোন করেন থানার নম্বরে।

'হ্যালো, শুনুন, রমনা পুলিশ স্টেশন, আমার নাতিকে হাইজ্যাক করেছে।'

'কে করেছে?'

'ব্যায়ামবীর ক্লাবের গুণ্ডারা।'

'ব্যায়ামবীর ক্লাব? ওখানে গুণ্ডা আসবে কোত্থেকে? ওটা ব্যায়ামবীর সমাজসেবক ক্লাব।'

'আমি নিজে দেখে এসেছি, ওই ক্লাবঘরে জুয়া খেলা হচ্ছে। সব গুণ্ডাপাণ্ডা ওখানে, আমাকে ধরে কী মারটাই না মেরেছে আবার আমার ৭ বছরের নাতিটাকে অপহরণ করেছে।'

'আরে না আপনি ভুল বলছেন। ওটা তো একটা বিখ্যাত ক্লাব। এই সপ্তাহখানেক আগে ওখানে জননেতা কায়েস চৌধুরীর সংবর্ধনা হলো। আমরা গেলাম। খুব ভালো ম্যানেজমেন্ট। চিকেন বিরিয়ানি করেছিল, আবার চিকেন কারি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজে দেখেছি। ওই ক্লাব ঘরটাই সব ক্রিমিনালের আখড়া। আপনারা এখনই চলুন আমার সঙ্গে আমার একমাত্র নাতিকে নিয়ে আমি বেড়াতে বের হয়েছিলাম। ওরা আমার নাতিকে কেড়ে নিল।'

'কেড়ে নেবে কেন? ওরা যদি নেয়, তবে সমাজসেবার জন্যে নিয়েছে। নিশ্চয় ওদের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।'

'মহৎ উদ্দেশ্য?'

'নিশ্চয়ই ওদের ফান্ড শর্ট পড়েছে।'

'ওদের ফান্ড শর্ট পড়েছে তাতে আমার নাতিকে কেন?'

'যা চায় দিয়ে দিন।'

'যা চায় দিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ, ওরা সমাজসেবা করবে না? ওটা সমাজসেবা ক্লাব না?'

'সমাজসেবা? জুয়া খেলা? লোক ঠকানো? বুড়ো মানুষকে ধরে মার দেওয়া? বাচ্চাদের অপহরণ করা? জিম্মি করে টাকা আত্মসাৎ করা?'

'আত্মসেবা না করলে সমাজসেবা করবে কী করে? সমাজের গলগ্রহ হয়ে তো আর সমাজসেবা করা যায় না?'

'কী বলছেন? আপনি জানেন আমি কে? আমি এক্ষুনি আইজির কাছে ফোন করব। আপনার নামে কমপ্লেইন করব। আপনার নাম বলেন।'

'আমার নাম শুনে কি করবেন?'

'মিনিস্টারের কাছে কমপ্লেইন করব। আপনার চাকরি খাব। আপনাকে ক্লোজ করাব।'

'আমি কি পুলিশ নাকি যে আমাকে ক্লোজ করবেন?'

'আপনি পুলিশ না? এটা কি পুলিশ স্টেশন না?'

'স্যরি রং নম্বর।'

'আপনি না বললেন এটা রমনা পুলিশ স্টেশন?'

'আরে তা কেন আমি বলতে যাব? এটা তো রমনা ফিলিং স্টেশন।'

'উফ রং নম্বর।' দাদা ফোন রেখে দেন।

৪

সাগরের আইসক্রিম খাওয়া শেষ হলে ভদ্রলোক দাম শোধ করেন। তারা বেরিয়ে আসে দোকান থেকে।

সাগর বলে, চলেন। এবার যাওয়া যাক। বাসার সবাই নিশ্চয় কাঁদতে শুরু করেছে। আমার আম্মা যা কাঁদতে জানেন।

'তোমাদের বাসা কোনদিকে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

'আরএস লেন ৫১ নম্বর বাড়ি। আমার নাম সাগর। আপনি একটা বেবিট্যাক্সি ডাকেন।'

ভদ্রলোক বেবি ডাকেন। তারা বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। বেবি চলতে শুরু করে। কিন্তু একটা ট্রাফিক সিগনালে এসে তারা পড়ে বিশাল যানজটে।

'আরে এই জ্যাম ছাড়বে না নাকি?' সাগর আর তাকে উদ্ধার করতে আসা ভদ্রলোক প্রমাদ গোনে।

এই সময় ঘটে আসল ঘটনা।

সত্যিকারের দুজন ছিনতাইকারী এসে তাদের বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। একজন অস্ত্র ঠেকায় বেবিচালকের ঘাড়ে। আরেকজন সাগরের কপালে। এইবার সাগরের মনে হয় সে প্যান্টের ভেতরে হিসু করে দেবে।

ছিনতাইকারীদের একজন ভদ্রলোককে বলে, সোজা নাইমা চইলা যান। দুই লাখ টাকা নিয়া জায়গা মতো আসেন। যান, নামেন। নাইলে গুলি করলাম।

ভদ্রলোক নেমে চলে যান। যাওয়ার আগে তিনি সাগরের দিকে করুণ চোখে তাকান।

যানজট কমে যায়। বেবিট্যাক্সি চলতে থাকে।

বেবিট্যাক্সি ছিনতাইকারীদের নির্দেশ মতো সাগরকে নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ে। সেখানে বেবিট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে তাকে তারা নিয়ে যায় একটা বস্তিঘরে।

অন্ধকার-প্রায় ঘর।

তাতে ঢুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে তারা জিজ্ঞেস করে, এই তোর নাম কী?

এইবার সাগর টিভি চ্যানেলের খবর দেখে শেখা তার জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগায়। কিছুতেই বাসার ঠিকানা বলা যাবে না।

বোবার অভিনয় করতে হবে।

সে জবাব দেয়, বো বো বো বো

এই তোর বাসার টেলিফোন নম্বর বল?

বো বো বো বো।

আরে যন্ত্রণা তো। এরে ধরাটাই তো ভুল হইছে।

তারা কষে চড় লাগায় সাগরের গালে। সাগর ততোই বোবো বোবা করতে থাকে।

'এরে এখানে বাইন্ধা রাইখা চল যাই গা। কালকার পেপারে নিশ্চয় নামঠিকানা বারাইব। সন্ধান দেন। সন্ধানদাতার জন্যে আছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। তখন কাম সারুম'– এক ছিনতাইকারী বলে আরেকজনকে।

'বাইর থাইকা তালা দিলেই তো হয়। এ তো বোবা। চিৎকার পাড়তে পারব না।'

'চল তালা দিয়া যাই গা।'

সাগরের হাত পেছন দিকে নিয়ে বাঁধে তারা। তারপর বাইরে থেকে তালা মেরে তারা বিদায় নেয়।

সাগর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে।

একটা জানালামতো দেখা যাচ্ছে। সে জানালার কাছে যায়। উঁকি দিয়ে দেখে, সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকি নেই। বাইরে গলিতে একটা বাচ্চা ছেলে, তারই সমান হবে, টোকাই জাতীয়, একা একা খেলছে। সাগর এবার বোবার ভূমিকা ত্যাগ করে।

'ভাই, শোনো'– জানালায় মুখ বাড়িয়ে সাগর বাইরের টোকাইটাকে বলে।

'কী, কয়া ফেলা'– টোকাইটা বলে।

'আমার এই শার্টটা দেব, নেবে?'

'তোমার শার্ট আমি নিমু কেন?'

'আচ্ছা এই প্যান্টটাও দেব নেবে?'

'আরে জ্বালা। পোলার মাথাত ছিট ভি আছে নি?'

'জুতা জোড়াও, নাও না ভাই।'

'লমু তো। কিন্তুক আমি ফকির না। কাম না কইরা জিনিস লই না।'

'তাইলে একটা কাজ করো। এই দরজাটা খুলে দাও না।'

'দরজাত তো তালা। হালা হালিমা ফকিরনির পুত গেছে কই?' টোকাইটা আপন মনে বলে।

'তুমি তালাটা খুলে দাও না'– সাগর মিনতি করে বলে।

'চাবি আছে?'

'না নাই।'

'তালা খোলনের বিদ্যা তো ছাইড়া দিছি। খাড়াও'– টোকাইটা বলে।

টোকাই ছেলেটা একটা তার খোঁজে। গলিতেই একটা তার পেয়ে যায়। তালা খুলে চুরি করার ট্রেনিং সে ভালোই নিয়েছিল। একবার ধরা পড়ে মার খাবার পর সে ছেড়ে দিয়েছে ওসব কাজ।

সে তালা খুলে ভেতরে ঢোকে।

'এখন আমার কাপড়চোপড়গুলো তুমি পরো। আর তোমার প্যান্টটা আমারে দাও'– সাগর বলে।

'ক্যান?'

'মজা। এইটা একটা খেলা।'

'হায়রে বড়লোকগুলানের খেলার শখ। অহন গরিব গরিব খেলতে চায়। লও।'

টোকাই ছেলেটা সাগরের কাপড়চোপড় পরে ফেলে। আর সাগর টোকাইয়ের কাপড়চোপড়গুলো। একটা ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি, একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট।

সাগর বলে, তোমার নাম কী?

'আমার নাম ইলিয়াস কাঞ্চন'– ছেলেটা বলে।

গলির মুখে চায়ের দোকান। সেখানে দুই অপহরণকারী বসে চা খাচ্ছে। তাদের সামনে দিয়ে সাগর বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু টোকাইয়ের ছেঁড়া ময়লা পোশাকে তাকে তারা চিনতে পারে না।

এদিকে সাগরের বাসা থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। সাগরের পরনে কী ছিল, সব বিবরণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

শিগগিরই তাদের বাসায় ফোন যায় থানা থেকে। আপনার ছেলেকে আমার উদ্ধার করতে পেরেছি। চলে আসেন থানায়।

সাগরের বাবা-মা-দাদা ছুটে যান থানায়। গিয়ে দেখতে পান, পুলিশ সাগরের বয়সী একটা ছেলেকে ধরে রেখেছে। আর আশ্চর্য হলো, তার পরনে সাগরের সব পোশাক।

এই দৃশ্য দেখে সাগরের বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের ধারণা হয়, তাদের সাগরকে মেরে ফেলে তার পোশাক এই ছেলেকে দেওয়া হয়েছে।

ঠিক এই সময় সাগর তার বাসায় হাজির হয়। তার পরনে তখন টোকাইয়ের মলিন শতচ্ছিন্ন পোশাক।

সাগর ফিরে এসেছে শুনে বাবা-মা-দাদা বাসায় ফিরে আসেন। তারা জড়িয়ে ধরেন সাগরকে।

দাদা বলেন, সাগর, তুই কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি। আর ফিরেই বা এলি কেমন করে?

সাগর বলে, সে অনেক কথা। পরে বলব।

সাগরের মা বলেন, আগে তুই বাথরুমে যা। গোসল কর। কী সব ময়লা কাপড়চোপড় পরে আছিস। এই, গরম পানি দে তো। সাগরকে গোসল করাব।

৫

ইলিয়াস কাঞ্চন ছেলেটা সাগরের উপকার করতে গিয়ে ধরা পড়ল। পুলিশ তাকে কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছে না। পুলিশের এক কথা, তুই সাগরের ড্রেস পেলি কী করে! সে যত বলে, ওই ছেলে আমারে নিজে থাইকা দিছে, পুলিশ তত রেগে যায়। তার গালে চড় মারে।

পুলিশের চড় খেয়ে ইলিয়াস কাঁদতে থাকে।

পাশের বাসার পরীর মেয়ে

দুপুর বেলা। বাসায় দাদি ঘুমুচ্ছে। আব্বু আর আম্মু গেছে অফিসে। জানালার ফাঁক গলে রোদ এসে মেঝেতে পড়ে আছে বেড়ালের মতো। ৮ বছরের কাব্য বিছানায় শুয়ে উসখুস করছে। তার ঘুম আসছে না। বাইরে একটা হকার 'পেপার আছে পুরানা পেপার' বলে সুর করে ডাকছে। কাব্য যদি এ রকম একটা হকারের সঙ্গে চলে যেতে পারত, দূরে কোথাও। সে বিছানা ছাড়ে। তাদের বাসায় কাজের ছেলে রতন, বয়স ১০, সে মেঝেতে শুয়ে ইতিমধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে। কাব্য ডাকে, 'রতন, এ রতইন্যা। ওঠ।' সে রতনের চুল ধরে টান দেয়।

'জি ভাইয়া, রতন চমকে জেগে ওঠে।

'চল, নিচে যাই। খেলি।'

'চলেন।'

তারা পা টিপে টিপে, চুপিচুপি, চোরের মতো দরজা খুলে বেরিয়ে যায় বাসা থেকে। দোতলা বাসা। নিচতলায় ভাড়াটে থাকে। দোতলায় কাব্যরা। বাসার পেছনে সীমানা-প্রাচীরের ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা আছে। তাতে কয়েকটা আম-কাঁঠাল-কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তার ছায়ায় দিব্যি খেলাধুলা করা চলে।

কাব্য আর রতন সম্প্রতি নতুন একটা খেলা আবিষ্কার করেছে। আর এ খেলার নেশায় তারা এখন মত্ত।

সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে কার্ড বানানো হয়েছে। আর সিমেন্টের প্লাস্টার খসা চাকতি দিয়ে বানানো হয়েছে ঘুঁটি।

একজন তার ঘুঁটিটা ছুড়ে মারে। তারপর কোনো এক বা একাধিক কার্ড বাজি রাখে। আরেকজন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সেই ঘুঁটিটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয় তার নিজের ঘুঁটিটা। যদি এক বিঘতের মধ্যে ফেলতে পারে, বা লাগাতে পারে, তাহলেই বাজিতে ধরা কার্ড জিতে যায় সে। না হলে হার।

কাব্য আর রতন নিচে নেমে গিয়ে এই খেলাটাই খেলছে। বেশ মগ্ন হয়ে।

এমন সময় ৪/৫ বছর বয়সী একটা ছোট্ট মেয়ে, ফুটফুটে দেখতে, ড্যাবডেবে চোখ, তবে হাত-পা খুবই পলকা, সুন্দর একটা সাদা টি-শার্ট পরা, তাদের সামনে কোত্থেকে যেন এসে হাজির হয়।

সে বলে, আমাকে তোমাদের সাথে খেলতে নেবে?

কাব্য হাসে, এই রতন, দেখ।

রতন বিস্মিত, হায় হায় এইডা কে?

মেয়েটি বলে, আমি তোমাদের বন্ধু।

কাব্য বলে, তোমাকে খেলা নেব কী করে? তুমি কি এই খেলা খেলতে জানো?

মেয়েটি বলে, না । জানি না। তবে অন্য খেলা খেলতে পারি।

কাব্য বলে, কী খেলতে পারো?

মেয়েটি বলে, রান্নাবাটি খেলতে পারি। তোমার নাম কি?

কাব্য বলে, কাব্য।

'কাব্য? এটা কোনো নাম হলো?' মেয়েটা চোখ কপালে তোলে। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে বলে, আর তোমার নাম?

রতন দাঁত বের করে বলে, রতন।

মেয়েটা গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে, তোমার নামটা সুন্দর। এসো রান্নাবাটি খেলি। আমি রান্না করব। কাব্য, তুমি বাজারে যাও। রতন, তুমি হলে সেলসম্যান।

রতন মজা পেয়ে যায়, হ। আমি দোকান সাজাইতেছি। ভাইয়া, আপনে টাকা লইয়া আসেন।

কাব্য হাসে, টাকা পাবো কোথায়?

রতন বুদ্ধি বের করে, গাছের পাতা দিয়া টাকা হবে।

কাব্য বলে, না। কার্ডগুলোকে টাকা বানাব।

কাব্য আর রতন খেলার মধ্যে ঢুকে যায়। মেয়েটা গাছের পাতা ছিঁড়ে থালাবাসন হাঁড়িকুড়ি বানায়। পরাটা গাছের পাতা দিয়ে পরাটা বানায়। কাব্য আর রতন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

কাব্য মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

মেয়েটা বলে, আমি হলাম পরীর মেয়ে মেঘবতী।

কাব্য আর রতন আবার খিলখিল করে হাসে।

এদিকে বাসায় দাদির ঘুম ভেঙে গেলে তিনি ডাকেন, রতন রতন। রতনের সাড়া নাই। আবার ডাকেন, আলো আলো। কাজের মেয়ে আলো ছুটে আসে।

দাদি বলেন, দেখ তো কাব্য কী করে। ওকে ঘুম থেকে তোল।

আলো কাব্যর ঘরে গিয়ে দেখে কাব্য নেই। রতন নেই। সে চিৎকার করে ওঠে। দাদি ছুটে আসেন। তাদের বুক কেঁপে ওঠে। খোঁজ খোঁজ।

দাদি সারা বাড়ি খোঁজেন। আলো প্রতিটা খাটের নিচে পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। না, পাওয়া যায় না। আলো ছাদে যায়। কাব্য আর রতনকে পায় না। শেষে ছাদ থেকে নিচে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির পেছনে গাছের নিচে কাব্যরা খেলছে।

আলো পাইছি পাইছি বলে চিৎকার করে নিচে নামে। আরে সঙ্গে এই মেয়েটা কে? আলো নিচে এসে অবাক। আলো বলে, কাব্য ভাইয়া, আপনেরা নিচে, আর আমরা সারা বাড়ি আপনাগো খুঁজি। চলেন চলেন। বাসাত চলেন।

কাব্য বলে, না- না, আমাদের খেলা শেষ হয় নাই।

মেয়েটা বলে, হুঁ। আমাদের খেলা শেষ হয় নাই। কইল একটা কথা!

আলো জিজ্ঞেস করে, এইটা আবার কে?

মেয়েটা তখন শক্ত গলায় বলে, আমাকে এইটা বলছ কেন? আমি ওদের বন্ধু।

আলো বিস্মিত, বন্ধু। কোত্থেকে আইল?

মেয়েটা বলে, আমি আকাশ থেকে এসেছি।

আলো ভ্রু কুঁচকে বলে, মানে?

মেয়েটা সহজ গলায় বলে, আমি পরী। পরীদের মেয়ে।

আলো হাসে, দুর। কী কয়? কোন্ বাড়ির মেয়ে তুমি কও না।

মেয়েটা বলে, আমি কোনো বাড়ির মেয়ে না। আমি আকাশে থাকি। মেঘের ওপরে থাকি। আমি পরীর মেয়ে মেঘবতী।

আলো বলে, এই কাব্য চলো বাসায় চলো। রতইনা। আজকা খালি বাসাত ঢুক। তোরে মাইরা ঠিক করব। চল।

কাব্য বলে, ঠিক আছে চলো। পরীর মেয়ে মেঘবতী, তুমি তোমার বাসায় যাও।

মেয়েটা বলে, আমার বাসা নাই। আমি তোমাদের সাথে যাব।

কাব্য বলে, আচ্ছা চলো।

আলো বলে, এইটা কার গো বাড়ির মেয়ে, জানি না, কিছু না। এই মেয়ে, তোমার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, আমার বাড়ি নাই। আমি কাব্যর বাড়ি যাব।

কাব্য বলে, আসো।

কাব্য, আলো, রতন আর বাচ্চা মেয়েটা বাসার ভেতরে ঢোকে।

দাদি বলেন, কাব্য বাইরে গেছিস কেন?

কাব্য জবাব দেয়, খেলতে।

দাদি বলেন, খেলতে যাবি, বলে যাবি না?

কাব্য বলে, আমরা তো বাবা বাইরে কোথাও যাই নাই। বাসার ভেতরেই তো আছি।

দাদি বলেন, খবরদার। আর কোনোদিন এই দরজার বাইরে না বলে যাবি না। রতন, যা কাজে যা। আজকা তোর কপালে কী আছে, টের পাবি। আর এটা কে?

আলো বলে, কী জানি? এইটা তো একটা তাজ্জব কাণ্ড।

দাদি বলেন, এই কাব্য, এ কে?

কাব্য বলে, কী জানি?

দাদি বলেন, রতন! এ কে?

মেয়েটা বলে, এরা জানে না আমি কে!

দাদি বলেন, ও বাবা। তুমি জানো তুমি কে?

মেয়েটা বেনি দুলিয়ে বলে, জানি।

দাদি বলেন, বলো।

মেয়েটা বলে, আমি পরীর মেয়ে মেঘবতী।

দাদি হাসেন। কী! ভারি মজা তো! এই তো হুমায়ূন আহমদের বইয়ের নাম।

আলো বলে, দাদি, আমার কিন্তু ডর ডর লাগতেছে।

মেয়ে বলে, আমাকে ভয় পাবেন না প্লিজ

দাদি বলেন, তোমাদের বাসা কোথায়?

মেয়ে বলে, জানি না।

দাদি বলেন, তুমি আমাদের বাসায় কেমন করে এলে?

মেয়েটা বলে, জানি না।

দাদি বলেন, তোমার আব্বু আম্মু তোমার জন্য চিন্তা করবেন না?

মেয়েটা বলে, না।

দাদি বলেন, আরে এত মুশকিল হলো। কার না কার মেয়ে!

আলো বলে, আমার মনে হয় এটা কোনো চান্দাবাজের কাণ্ড। মেয়েটাকে এ বাড়িতে ঢুকায়া দিয়া এখন আসবে চান্দার লাইগা।

দাদি আঁতকে ওঠেন, কী বলিস?

আলো বলে, নাইলে হইতে পারে কারো মেয়ে হাইজাক কইরা এই বাড়িতে রাইখা গেছে। পুলিশ আইলে আমগো ধরব। না আইলো অরা বাপমার কাছে যাইয়া টাকা আনব।

মেয়ে বলে, আমাকে কেউ ধরে আনে নাই। হাইজাকও করে নাই।

দাদি বলেন, তাহলে?

মেয়ে বলে, আমি নিজে এসেছি।

দাদি বলেন, কেমন করে এসেছ?

মেয়ে বলে, আমি নিজে এসেছি।

দাদি বলেন, কেন এসেছ?

মেয়ে বলে, এই বাসাটা ভালো। আমার পছন্দ হয়েছে।

দাদি বলেন, এই বাড়ি ভালো?

মেয়ে বলে, হ্যাঁ। কাব্য ভালো। রতন ভালো। তুমি কাব্যর দাদি?

দাদি বলে, হ্যাঁ।

মেয়েটা বলে, তাহলে তোমাকে আমি অনেক আদর করব।

দাদি হাসেন, উরি বাপরে।

মেয়েটা বলে, দাদি আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে খেতে দাও।

দাদি বলেন, কী খাবে?

মেয়ে বলে, কী আছে? আইসক্রিম!

দাদি বলেন, না। তোমাকে আইসক্রিম দেওয়া যাবে না। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মেয়েটা বলে, তুমি পচা।

দাদি বলেন, ভাত খাবে?

মেয়েটা বলে, আমি তো পরী। আমি ভাত খাই না।

দাদি বলেন, তাহলে তুমি কী খাও?

মেয়েটা বলে, চকলেট আছে!

দাদি বলেন, তা তোমাকে দিতে পারি।

মেয়েটা খুব সহজ ভঙ্গিতে বলে, দাও।

দাদি তাকে চকলেট দিলে সে চকলেট খেতে থাকে। দাদি বলেন, তুমি স্কুলে পড়ো?

মেয়েটা বলে, পড়ি।

দাদি বলেন, কোন্ স্কুলে।

মেয়ে বলে, বলব না।

দাদি বলেন, তোমার বাসা কি আশেপাশে কোথাও?

মেয়ে বলে, জানি না। কাব্য কই গেল। আমাকে কাগজ আর কালার দাও। আমি ছবি আঁকব।

দাদি তাকে কাব্যর ঘরে নিয়ে যান। কাব্য তাকে ছবি আঁকার কাপজপত্র দেয়। ছবি আঁকতে আঁকতে মেয়ে বলে, এই কয়টা বাজে?

কাব্য বলে, সাড়ে ৫।

আমি বাসায় যাব।

দাদি দাদি। ও বাসায় যেতে চায়– কাব্য চিৎকার করে বলে।

দাদি এ ঘরে আসেন।

মেয়ে বলে, দাদি। আমার মাম এখন আসবে। এখন আমি বাসায় যাবো।

দাদি বলেন, তোমার বাসা কোথায়?

মেয়ে কিছু বলতে পারে না। ভয়ে কাঁদে।

দাদি বলেন, তোমার বাবার নাম কী?

মেয়েটা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না।

দাদি বলেন, তোমার নাম বলো। তোমার বাবার নাম। মার নাম। বাসা?

মেয়ে শুধু মাম মাম বলে কাঁদতে থাকে। আরে, ভারি যন্ত্রণায় পড়া গেল তো।

রতন বলে, ভাইয়া চলেন ওরে নিয়া আবার নিচে যাই। ও যে দিক দিয়া আসছিল, সেদিক দিয়া যদি যাইতে পারে।

ঠিক বুদ্ধি। কাব্য, রতন, দাদি, আলো মেয়েটাকে নিয়ে নিচে যায়। আবার বাসার পেছনের আম-কাঁঠালের গাছের নিচে।

কাব্য বলে, দেখো তো তুমি কোনদিক দিয়ে এসেছিলে।

মেয়ে একটু একটু এগোয়। বাসার পেছনে একটা গেট আছে। সেই গেট দিয়ে সে বাইরে যায়। এদিক ওদিক তাকায়। তাকে বিভ্রান্ত দেখায়। সে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে।

একটা বাসার সামনে গিয়ে জোরে কাঁদলে ভেতর থেকে একটা কাজের মেয়ে বের হয়ে আসে। সে বলে, আল্লাহ সানজানা! তুমি রাস্তায় কেন? আসো আসো।

দাদি বলেন, তুমি এই বাসার?

মেয়েটা বলে, হ্যাঁ।

দাদি বলেন, তোমার নাম সানজানা।

মেয়ে বলে, হ্যাঁ।

দাদি ওদের কাজের মেয়েকে বলে, এই বাসায় আর কে আছে?

কাজের মেয়ে বলে, বাসায় আর কেউ থাকে না। খালাম্মা খালু দুইজনেই চাকরি করে। আমি একাই সানজানা আপুরে দেইখা রাখি।

দাদি বলেন, আর কেউ থাকে না?

কাজের মেয়েটা বলে, সানজানার দাদি আগে আছিল। শাশুড়ি-বউয়ে ঝগড়া কইরা হের দাদি হের ফুপুর বাড়ি গেছে গা।

ঠিক এই সময় একটা বড় জিপ এসে বাসার সামনে থামে। অফিসের গাড়ি। নামেন সানজানার মা।

তিনি বলেন, এই, বাসার সামনে এত ভিড় কেন? এই ফতে, সানজানা বাইরে এলো কেমন করে? তুইই বা বাইরে কেন?

কাজের মেয়ে বলে, আজকা ভুল কইরা তালা দিতে ভুইলা গেছলেন।

সানজানার মা বলেন, এই আপনারা কী চান? যান যান।

মেয়েকে নিয়ে তিনি বাসার ভেতরে ঢুকে গেট আটকে দেন।

কাব্য, রতন, আলো, দাদি পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখন তাদেরও বাসায় ফেরা উচিত।

ওই বাসার ভেতর থেকে সানজানার কান্নার আওয়াজ আসছে। কাব্যর খুব কান্না পায়। পরীর মেয়েটাকে ওরা কি মারছে?

দাদি বলেন, চলো চলো, বাসায় চলো। তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারা বাসায় ফেরে।

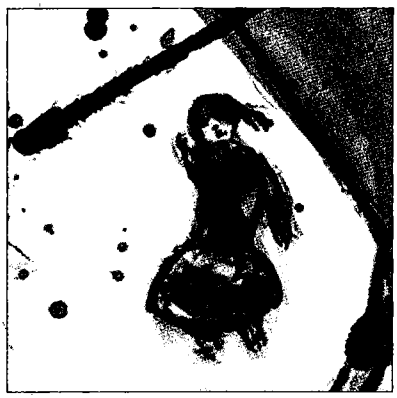

তিতি ও মিতির গল্প

তিতি ও মিতি দুই বাচ্চা মশা। তারা জন্ম নিয়েছে একটা আইসক্রিমের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক পাত্রে। জন্মের পর তারা আরামেই ছিল। বয়স কম, দিন-দুনিয়ার চিন্তা নাই, শুধু খেলা আর খেলা। আর খাবার-দাবারেররও কোনো অভাব নাই। সৃষ্টিকর্তা এই ঢাকা শহরে মশার খাদ্য ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে চলেছেন। মানুষের কোনো আকাল এই শহরে নাই। আর গরমকালে তাদের দেহ তারা অনাবৃত রাখতে বাধ্য। ব্যস। খিদে লাগলেই হাতের কাছে যে মানুষটিকে পাও, একটা ছোট্ট কামড় বসিয়ে দাও। পেট ভরে যাবে। পেট ভরা থাকলে মনেও ফুর্তি থাকে। তিতি আর মিতি মনের আনন্দে গান গাচ্ছে। তাদের গানটা হলো: চোঁ চোঁ চোঁ, যাকে পাস, তাকে ছোঁ।

ঠিক এই সময় মাইকে ঘোষণা শুরু হলো, প্রিয় মশক-মশকী ভাই ও বোনগণ, জরুরি ঘোষণা। জরুরি ঘোষণা। আগামী ১১ আগস্ট সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। এ দিন ব্যাপক হারে মশক নিধন হবে বলে আশংকা রয়েছে। সকল মশাকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখানো হচ্ছে। আপনারা যে যেখানে থাকবেন, সাবধান থাকবেন। ওই দিন কোনা-কাঞ্চি ছেড়ে উন্মুক্ত স্থানে চলাচল করার দরকার নাই। খাদ্য-পানীয় আগে থেকে যোগাড় করে রাখুন। যদি ব্যাপকভাবে এয়ার এটাক হয়, তার জন্যে সব ধরনের মানসিক ও বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখুন। সবাই এ দিন ট্রেঞ্চে থাকুন। যদি ফগার বা স্প্রে মেশিন দিয়ে এয়ার

এটাক শুরু হয়, তার আগেই সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হবে। মনে রাখবেন, এখন আমরা যুদ্ধে আছি। আমাদের যুদ্ধকালীন এলার্টনেস বজায় রাখতে হবে। আতঙ্কিত হবেন না, আতঙ্ক ছড়াবেন না, তবে সাবধান হোন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মশাদের যেমন বাঁচার অধিকার আছে. তেমনি অতি অসহায় জীব মানুষেরাও বাঁচার চেষ্টা করবে। সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট। স্রষ্টার ইচ্ছায় আমাদেরই জয় হবে। মনে রাখবেন, সুখেদুখে মশকনগরী করপোরেশন আপনাদের পাশে আছে। মশকস্বার্থে– পৌরপিতা, মশকনগরী করপোরেশন।

এই ঘোষণার মাথামুণ্ডু তিতি আর মিতি কিছুই বুঝল না। তবে সাংঘাতিক একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, এটা তারা উপলব্ধি করতে পারল। এমন সময় তাদের মা ছুটে এলেন। বললেন, বাছারা কই তোরা, আয় আয় আমার বুকে আয়, কী খারাপ দিনই না এলো। এতদিন তো তবু তোদের রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু আর বুঝি শেষরক্ষা হলো না। মানুষগুলোর কী দুমর্তি হলো যে একেবারে ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস পালন করতে হবে। যদিও আমাদের পৌরপিতার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে, চিন্তার কিছু নাই, কিন্তু ওই দু-পেয়েদের কোনো বিশ্বাস আছে? নিজেদের স্বার্থে এরা করতে পারে না, হেন কাজ নাই। হয়তো ১১ তারিখে এমন কোনো অস্ত্র প্রয়োগ করে বসল, সারা শহরের মশারা মরে পড়ে রইল কাতারে কাতারে। একেবারে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে ছাড়ল।

তিতি বলল, এখন তাহলে কি হবে মা?

মিতি বলল, মা, কালকেই যদি মরে যাই তাহলে তো আমাদের বিয়েই হবে না

মা বললেন, চল, একটা গোপন গহ্বর বের করেছি। ওখানে হাইডআউট করব। একটা দিনই তো। তবে মানুষ আমাদের সাথে পারবে না। আমরা হলাম এডিস মশা । আমরা তো আর নর্দমা-মজা-হাজা পুকুরে জন্মাই না। আমরা হলাম পরিষ্কার জমে থাকা পানির জীব। আমাদের মারা সহজ নয়। স্প্রে করে ফগার মেশিন লাগিয়ে আমাদের শেষ করতে পারবে না। দেখিস।

তিতিরা আশ্রয় নিল একটা মাটির নিচের একটা গোপন গুহায়। সেখানে আরো কয়েকটা মশক পরিবার ঠাঁই নিয়েছে।

বড়রা আলাপ করছে। তিতি আর মিতি মন দিয়ে শুনছে। দুর্যোগকালে এ রকমই হয়। বড়-ছোটর ভেদ যায় লুপ্ত হয়ে। তখন ছোটরা বিনা বাধায় বড়দের আলাপ শুনতে পারে। অন্য সময় হলে কতবার বলা হতো, তিতি, মিতি যাও বাইরে যাও, বাইরে গিয়ে খেলাধুলা করো। বড়দের আলাপে শুঁড় গলাচ্ছ কেন?

একজন মুরুব্বি মশা বললেন, মানুষ যে এত মরিয়া হয়ে উঠেছে মশা মারার জন্যে, সেটা তো কেবল মানুষের দোষ নয়, মশাদেরও দোষ আছে। মানুষ দেখলেই কামড়াতে হবে? বুঝেসুজে কামড়াবি না? এই বর্ষায় ডেঙ্গুতে ডাক্তার মরেছে দুজন, ছাত্র মরেছে একাধিক। এরপর আবার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মারা গেছেন সিএমএইচ-এ। এরপরও কি মানুষেরা ক্ষেপবে না?

অন্য সবাই তার সঙ্গে একমত হলেন। তাই তো। এত লোভ ভালো না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্য। এই অবিমৃষ্যকারীদের জন্যে এখন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মরতে হবে।

১১ তারিখ পার হয়ে গেল। কিছু শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই ঘটল না। তিতি-মিতির বেরিয়ে এলো গহ্বর থেকে। তিতি, বলল, মা, কিছুই তো হলো না। তোমরা অযথা ভয় পেয়ে গিয়েছিলে!

মা বললেন, আরে এটা তো ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস ছিল না। এটা ছিল সচেতনতা দিবস। মানুষেরা চেয়েছিল সব মানুষকে সচেতন করতে। কিন্তু এরা তো শুধুই মানুষ না, এরা হলো ঢাকার মানুষ। এদেরকে কি আর সচেতন করা যায়। যতই বলা হোক না কেন, নিজেদের ঘরদোর পরিষ্কার রাখেন, বাড়ির ভেতর বাইরে কোথাও পানি জমতে দেবেন না, এরা কি আর সেই কথা শুনবে? এরা তাকিয়ে থাকবে সিটি করপোরেশনের ফগার মেশিনের দিকে। কখন সিটি করপোরেশনের লোকেরা এসে মশা মেরে দেবে। তাই কি আর হয়? ওই ভাবে এনোফিলিস কিউলেক্স মশা মারা যায়, এডিস মশা নয়।

চিঁচি খালা এলেন এই সময়। বললেন, শোনো, একটা খারাপ খবর আছে। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম নামে এক বড় ডাক্তার নাকি বলেছেন,

সেনাবাহিনী নামিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করা হোক, কোথাও পরিষ্কার পানি জমে আছে কিনা। এটা করা হলে তো খুব মুশকিল। বাঙালিকে সচেতন করে কোনো কাজ করানো যায় না, কিন্তু শাস্তির ভয় দেখালে আবার সবাই সোজা হয়।

মা বললেন, আমার মনে হয় না, মানুষ এই বুদ্ধি গ্রহণ করতে যাবে। সংবাদপত্রের কলাম অনুযায়ী দেশ চলে না।

চিঁচি খালা বললেন, ঠিক ঠিক। তবু সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তাকে কামড়ানোটা ঠিক হয়নি।

মা বললেন, নিশ্চয় উচিত হয়নি। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এর আগে ঢাকার মনুষ্য-মেয়রকে কামড়ানো হয়েছে, তার ডেঙ্গু হয়েছে, তারপরেও তো আমরা বহাল তবিয়তে আছি। এবারও কিছু হবে না দেখো।

চিঁচি খালা বললেন, ওই যে একটা মানুষের বাচ্চা ঘুমাচ্ছে। চল, ওর রক্ত খাই।

মা বললেন, কী সুন্দর একটা মানবশিশু। ওর রক্ত খেলে তো ওর ডেঙ্গু হয়ে যাবে। ওকে বাদ দিয়ে অন্য কারো রক্ত খাই চলো।

চিঁচি খালা বললেন, এটা তুই কী বললি? মানুষ যখন মুরগি খায় তখন কি বেছে বেছে বাচ্চা মুরগি খায় না? মুরগির ডিম খায় না? আমরা কেন ছাড় দেব? এই শহরটা হলো আমাদের অর্থাৎ মশাদের মনুষ্যখামার। এই মানুষদের আমরাই পুষে পেলে বড় করেছি। এখন ইচ্ছামতো এদের রক্ত খাব। চল চল।

মশারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটার ওপরে।